উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই, ১৮৫৭’র লড়াই এবং সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ (পর্ব-১)

ফাহমিদ-উর-রহমান

১

১৮৫৭’র বিপ্লব, অভ্যুত্থান ও জিহাদ সম্বন্ধে আজতক অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশের লেখক আবার বিদেশীয়। এবার এর সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র ও নজিরবিহীন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার পুনরালোচনা ও পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্কটিশ লেখক উলিয়াম ডালরিম্পল ১৮৫৭’র রক্তরাঙ্গা ইতিহাসকে সামনে রেখে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন যার নাম The Last Mughal: The fall of a dynasty, Delhi, 1857.

ডালরিম্পল ইতিমধ্যে মোঘলদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। অনেকেই বলে থাকেন, এই স্কটিশ লেখক মোঘল সংস্কৃতির একজন নিবিড় রসপিপাসু ও অনুগ্রাহীও বটে।

ভারতবর্ষে মোঘলরা এক গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। নাগরিক মনন আর রুচি বলতে এখন যা আমরা বুঝি ভারতবর্ষে তা এই সভ্যতারই কতকটা দান সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। গোলাপ, গজল, কাসিদা আর দৃষ্টিনন্দন চিত্রকলা ও স্থাপত্যশৈলী যেমন মোঘলদের একান্ত নিজস্ব, তেমনি রসনালোলুপ সুস্বাদু মোঘলাই খাবার ও পশমি জরিদার পোশাক-পরিচ্ছদও মোঘলরা ভারতবর্ষে আমদানি করেছিল। কিন্তু এসব কিছু ছাড়িয়ে মোঘল শাসনের যে বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে উল্লেখ করবার মতো তা হচ্ছে এটা ছিল পুরোপুরি উদার, অসাম্প্রদায়িক, বহুত্ববাদী মনমানসিকতাসম্পন্ন। এই হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির অলিগলি দিয়ে ডালরিম্পল হাঁটাহাঁটি করেছেন বিস্তর। এই হাঁটাহাঁটির খবর আমরা পাই তার কৃত আর দু’টি জনপ্রিয় বই City of Djinns ও White Mughals-এ। এ বই দু’টিও তার খ্যাতির বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছে।

ডালরিম্পলকৃত The Last Mughal ১৮৫৭’র বিপ্লবের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। কেবল বিপ্লব চলাকালীন বাহাদুর শাহ জাফরকে ঘিরে দিল্লীতে যে খুনরাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যে অভাবনীয় মহাবিপর্যয় দিল্লীর মানুষকে পেঁচিয়ে ধরেছিল তার এক অশ্রুসিক্ত, অথচ সুখদ বর্ণনা। লেখকের বর্ণনার মধ্যে এক ধরনের আপাতনিরপেক্ষতা আছে যার কারণে পাঠক সহজে পীড়িত হয় না, বিশেষ করে মোঘলদের দিল্লীর সংস্কৃতির সাথে লেখকের নিবিড় সম্পর্ক এবং সেই সময়ের দিল্লীকে নিয়ে তার মৌলিক পড়াশোনা, গবেষণা ও কাজকর্ম বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। তবে এ বইটির লেখনশৈলী হচ্ছে উল্লেখ করার মতো জিনিস। রাজরাজাদের কাহিনী কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস যেভাবে লেখা হয় সেই প্রচলিত ধারা থেকে ডালরিম্পল সরে এসেছেন।

বইটি পড়তে গেলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন ইতিহাসের চরিত্রগুলো কিভাবে লেখকের লেখার কারুকার্যে জীবন ফিরে পেয়েছে এবং পাঠক সেই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের ভিতরে হারিয়ে গেছেন, তাদের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর দুঃসহ স্মৃতিকাতরতার সাথে শরীক হয়েছেন। মাঝে মাঝে ধাঁধায় পড়তে হয় ইতিহাস না ফিকশন পড়ছি! এ বই যে কোন হৃদয়বান পাঠককে শুধু আকর্ষণই করবে না, বাহাদুর শাহ জাফরের ট্রাজিক পরিণতি তার চোখে আঁসুর দরিয়াও বইয়ে দেবে, বিশেষ করে বৃটিশরা দিল্লী পুনরুদ্ধারের পর যে অমানুষিক ও বীভৎস অত্যাচার করেছিল যা সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকরা প্রায়শই এড়িয়ে গেছেন কিংবা এই ঘটনাকে বিপ্লবী সিপাহীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবে পুরো ঘটনাটির সরলীকরণ করতে চেয়েছেন ডালরিম্পল সেই পর্দা সরানোর কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিপ্লবী সিপাহীদের পরাজয়ের পর বৃটিশরা দিল্লীতে শুধু গণহত্যার

উৎসবে মেতে ওঠেনি, মোঘল সংস্কৃতির শেষ চিহ্নকে উপড়ে ফেলার কাজেও তাদের ক্লান্তিহীন উদ্যম রীতিমত পীড়াদায়ক। মোঘল স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শনগুলো পরিকল্পিতভাবে তারা কামানের গোলা আর বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। বৃটিশরা শুধু গণহত্যা করেনি, তারা একটা সংস্কৃতিকেও হত্যা করার চেষ্টা করে।

১৮৫৭-৫৮ সালে দিল্লীতে বৃটিশরা যা করেছিল তা আমাদের স্পেনের Reconquistaর ধ্বংসযজ্ঞ ও হাল জামানর বসনিয়ার Ethinic cleansing-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। স্পেনে মৌলবাদী খৃস্টানরা মুসলমানদের বিতাড়িত করবার পর সেখানকার বিখ্যাত মস্ক অপ কর্ডোভার স্থাপত্য শৈলীকে বিকৃত করে দিয়ে এটিকে চার্চে পরিণত করে যা দেখে পরবর্তীকালে রিলকে অক্ষেপ করেছিলেন এবং বর্বর খৃস্টানদের নিন্দা জানিয়েছিলেন। দিল্লির এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখবার জন্য বেঁচেছিলেন ১৮ শতকের শোঘল সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম রত্ন মীর্জা গালিব। দিল্লীর রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে বেঁচে যোওয়া কবি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, রক্তসমুদ্রে ভাসমান এক সাঁতারু। অন্যত্র এক বন্ধুর কাছে পাঠানো তাঁর অন্তর মথিত বেদনাশ্রু এভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

Every armed British soldier Can do whatever he wants. Just going from home to market Makes ones heart turn to water. The chowk is a slaughter ground And homes are prisons. Every grain of dust in Delhi Thirsts for Muslims blood. Even if we are together We could only weep our lives.

১৮৫৭র সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ডালরিম্পলের বইটি ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যা যে কোন লেখকের জন্য বিরাট প্রাপ্তি। অমর্ত্য সেন, কুলদীপ নায়ার, জিয়াউদ্দীন সর্দারে মত পণ্ডিতেরা বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গৌরবোজ্জ্বল মোঘল সংস্কৃতি অবসান হবার ট্রাজিক ঘটনাই বোধ হয় পাঠককে টেনেছে বেশি এবং ডালরিম্পল এক অদ্ভুত স্মৃতি কাতরতার মধ্যে পাঠকের অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছেন।

কিন্তু ১৮৫৭ সালে এই যে এত বড় ঘটনা ঘটলো তার পটভূমির বিস্তার ও বৃটিশ অত্যাচারের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকবার পরও ডালরিম্পল কি পুরোপুরি গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন? পাঠককে স্মৃতিকাতরতার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের ঔপন্যাসিক সফলতা থাকতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক হিসেবে অভ্যুত্থানের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে তিনি সনাতনী ধারার বাইরে আসতে পারেননি বলেই মনে হয়্। সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকরা বা এখনকার নিওকন ঐতিহাসিকরা যে ধারার অনুবর্তী, তার সঙ্গে ডালরিম্পলের মৌলিক পার্থক্য বড় একটা নেই, অথচ তার নিজের লেখার মধ্যেই বহু তথ্য আছে যার থেকে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারত। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিবিড় পাঠে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা হলো বাহাদুর শাহ জাফর কিংবা তাঁর বিপ্লবী সিপাহীদের কর্মকাণ্ডকে তিনি উপনিবেশকারীর বিরুদ্ধে উপনিবেশিতের লড়াই কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের আজাদী সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করেননি। বিপ্লবী সিপাহীদের কর্মকাণ্ডের নিরপেক্ষ ও সুখপাঠ্য সামরিক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন কিন্তু তাদেরকে স্বাধীনতার সৈনিক ভাবতে ডালরিম্পলের মন আটকেছে। বইটির বহু স্থানেই তিনি সিপাহীদের mutineers বলে উল্লেখ করেছেন যা পীড়াদায়ক। যারা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি তাদেরকে loyal বলাটাও দৃষ্টিকটু। উপরন্তু ডালরিম্পল ভারতবর্ষব্যাপী ১৮৫৭র পুরো ঘটনাকে দেখতে চেয়েছেন দুটি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব হিসেবে, যাতে কিনা এর বিপ্লবী তাৎপর্যকে অনেকটা খাটো করা হয়েছে। সেদিনকার ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম শক্তির সাথে আগন্তুক জবরদখলকারী খৃস্টান শক্তির একটা প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব অবশ্যই কাজ করেছিল সত্য কিন্তু সেটিই এ ঘটনার পুরো চিত্র মাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত এটি ছিল জবর দখলকারীর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের আজাদীর লড়াই।

২

১৯৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে মরহুম মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন, ১৮৫৭র লড়াই সম্বন্ধে বেশির ভাগ বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর এ উক্তি মিথ্যা নয় এবং আজতক এ অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি বলেই মনে হয়। উপমহাদেশের ঐতিহাসিকদের একটা বিরাট অংশের মনে সাম্রাজ্যবাদের সেই দেখবার ধরনটি অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। নানা রকম তত্ত্বজাল বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদ ও তার গোলাম ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন উপনিবেশবাদ ছিল উপনিবেশিত জনগণের জন্য কল্যাণকর। এর পক্ষে তারা ভূরি ভূরি নজিরও তুলে ধরার কোশেশ করেছেন। সেসব যুক্তিকে কি কুযুক্তি বলা যায়? যেমন সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয়দের কাছে পশ্চিমা সভ্যতার আশীর্বাদ বহন করে এনেছিল অথবা ভারতবর্ষের বদ্ধ ও কুপমণ্ডুক সমাজে সংস্কারের নবতরঙ্গ বইয়ে দিয়েছিল কিংবা আজকে যেমন বলা হচ্ছে সভ্যতার দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলোতে তাদের অপকর্মকে বৈধতা দেয়ার জন্য এসব তত্ত্ব হাজির করেছিল। বৃটিশ রাজকবি রাডইয়ার্ড কিপলিং সাম্রাজ্যবাদীদের সেসব কাজকর্মকে নতুন মাত্রা দিয়ে বলেছিলেন White Mens Burden ভাবটা এমন - সাম্রাজ্যবাদীরা না এলে উপনিবেশের মানুষগুলোর মুক্তি ঘটতো না, সভ্যতার আলো থেকে তারা চিরবঞ্চিত হয়ে রইতো। বড় রকম করুণা দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলোতে সভ্য করবার মিশন নিয়ে এসেছে। ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহের কারণ

সম্বন্ধে এ বইয়ে ডালরিম্পলের গভীর কোন বিশ্লেষণ নেই। সাবেকি রচনার মতো চর্বি মেশানো টোটার ফলে উদ্ভূত সিপাহী অসন্তোষের তিনি কিছুটা হালকা বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু লেখকের হয়তো বিশ্বাস এই আলোড়নের মধ্যে সিপাহীদের বিদ্রোহী আচরণ ছাড়া অন্য কিছুর বিশেষ তাৎপর্য নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মনির্বিশেষে দলে দলে এই সব বিপ্লবী সেনা বাহাদুর শাহ জাফরকে সম্রাট কবুল করে দিল্লীর দিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। এ কি কোন তাৎপর্যহীন ঘটনা ছিল কিংবা বিশেষ কোন পটভূমি ব্যতীত এত বড় অভ্যুত্থান ঘটে গেলো তা ভাবা বেশ কঠিন বৈকি! ভারতে পশ্চিমা সভ্যতার আশীর্বাদের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জুলুম, লুণ্ঠন, উৎপীড়ন যে অনেক বেশি ছিল তা দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকরা ইতিমধ্যে সপ্রমাণ করেছেন, অথচ বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণে গ্রন্থকার এর উপর কিছুমাত্র জোর দেননি। বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের সংগ্রাম যে অবধারিত ছিল তা নিয়ে সংশয় নেই। শুধু অবস্থা বৈগুণ্যে সিপাহীরা নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, পরে সর্বস্তরের জনগণ্য এই অভ্যুস্থানে অংশ নেয়। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো ১৮৫৭-তে দিল্লীর যুদ্ধচলাকালে ডালরিম্পল অহেতুক ওহাবী ও জেহাদী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। বৃটিশরা ওহাবী শব্দটা ব্যবহার করতো গাল হিসেবে, যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজকাল জিহাদ শব্দটা একই অর্থে ব্যবহার করে। ওহাবীরা ছিল পিউরিটান ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী, একই সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। বৃটিশবিরোধিতার অপরাধেই সাম্রাজ্যবাদের মিডিয়া তাদের চরিত্র হননে লিপ্ত হয় এবং তাদের পিউরিটান আদর্শের জন্য ফ্যানাটিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আজকালকার সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া যেমন করে ইরাকে বা আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামীদের মৌলবাদী হিসেবে গাল পাড়ছে।

প্রকৃত সত্য হলো বাহাদুর শাহ জাফরের আনুগত্য কবুলকারী ফৌজদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাদের কথা মতো দেশ ও ধর্ম রক্ষার জন্য তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। ওহাবীরা এদের সাথে গলাগলি করে আজাদীর যুদ্ধে শরীক হয়েছিল মাত্র। ধর্মাশ্রিত আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার নমুনা পৃথিবীতে একেবারে বিরল নয়। হিন্দু ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে আমাদের সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম প্রমুখেরা বৃটিশবিরোধিতায় নেমে পড়েছিলেন। বৃটিশরা এদেরকে টেররিষ্ট বলতো। আমাদের কোন প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবীরা এজন্য তাদেরকে সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ, মৌলবাদী বলেছেন শুনিনি। তাহলে ওহাবী, ফরায়েজীরা সাম্প্রদায়িক, মধ্যযুগীয় হন কোন যুক্তিতে? ১৮৫৭র অভ্যুত্থানের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু মুসলমান ঐক্য এবং এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। দলে দলে হিন্দু ফৌজরা এসে মুসলমান বাহাদুর শাহর আনুগত্য কবুল করেছে এই কারণে যে, তারা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল, বৃটিশের চেয়ে মোঘল শাসন ছিল উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রজাবৎসল ও মানবতাবাদী চরিত্রসম্পন্ন। এই কারণেই তারা মোঘল শাসনের পুনরুদ্ধারের জন্য জানবাজী রেখে লড়াই করেছিল।

মওলানা আজাদ লিখেছেন, মোঘল আমলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দেখা যায়নি এবং সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটিও মোঘল সংস্কৃতির কাছে পরিত্যাজ্য ব্যাপার ছিল। কেবল বৃটিশরা এসেই তাদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়-বাড়ন্ত করে তোলে।

বইটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় ১৮৫৭ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, শাসকদের বোকামী ও ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি এবং শাসিতদের মনে সন্দেহ ও ভুল বোঝার একটা গুরুতর সংযোগ ঘটেছিল। এই কারণে বিপ্লবের আগুন দ্রুত বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল। ডালরিম্পলের এই বিবেচনা অসম্পূর্ণ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ঘটনার বর্ণনায় ডালরিম্পল যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন ঘটনার মূল্যায়নে তার সীমাবদ্ধটাও একেবারে ফেলনা নয়।

৩

সেই যুগে পৃথিবীর অন্যত্র যেভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার চলেছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব যে সেই উপনিবেশ গঠনের রকমফের তা বলাই বাহুল্য। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে উপনিবেশকারীরা ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব কষে তাদের যাবতীয় কুকর্মকে নৈতিক ভিত্তি দেয়ার জন্য নতুন নতুন তত্ত্ব হাজীর করে এবং একটা ইতিহাসের কারখানা গড়ে তোলে। এই কারখানায় বসে তারা উপনিবেশের মানুষের ইতিহাসকে ইচ্ছামত বিকৃত, বিচ্যুত ও বিধ্বস্ত করে। তারা এসেছিল নতুন রকমের দাসপ্রথা চালু করতে, অথচ এসবের নাম দিয়েছিল স্বাধীনতা। একালে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে হানা দেয়ার সময় বলেছিল Operation Iraq Fredom। এসব কান ফাটানো ঘৃণা উদ্রেককারী আজব চিজের তাহলে অর্থ কি? অর্থ একটাই, উপনিবেশকারী হানাদাররা সব সময়ই নিজেদের জনগণের মুক্তিদাতা বলে পরিচয় দেয়।

বৃটিশরা আমাদের তিতুমীরকে বলতো বোকা ও ধর্মোন্মাদ। ফকির সন্ন্যাসীদের সেকালের বৃটিশ সিভিল সার্ভেন্টরা সরকারি গেজেটিয়ারে Raiders-ডাকাত বলে রিপোর্ট করেছেন। দেশের জন্য যারা লড়াই করছে, জানবাজী রাখছে তারা বোকা, ডাকাত হতে যাবে কেন? উপনিবেশ পন্থার নৈতিক প্রতারণাই এ রকম। অন্যথায় তাদের অবৈধ কর্মযজ্ঞের বৈধতা মিলবে কোথায়?

সিপাহী বিদ্রোহ কথাটা ইংরেজরাই তাদের কারখানায় উদ্ভাবন করেছিল। ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে বৃটিশ শাসক, ঐতিহাসিক ও বৃটিশের অনুগত দেশীয় ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতীয় বিদ্রোহ, দ্যা ইন্ডিয়ান মিউটিনি বলে প্রচার করে। এতে মনে হতে পারে দেশের মানুষ নয়, এটা ছিল গুটি কয়েক পাগলা সিপাহীর উল্টা পাল্টা কাণ্ডকারখানা, কোনো দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা বিদ্রোহ করেছিল। তার সঙ্গে জনগণের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

১৮৫৭ সালের ঘটনার বহুদিন পরও বৃটিশরা পত্র-পত্রিকায় পাঠ্যপুস্তকে এভাবে প্রচার প্রপাগান্ডা চলায়। শুধু তাই নয়, কলোনির শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত এ ঘটনাকে স্বাধীনতার লড়াই হিসেবে মেনে নেননি। এদের মধ্যে এম. এন. রায়, রজনী পামে দত্ত, যদুনাথ সরকার, আর. সি. মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায়ের মত বুদ্ধিজীবীরাও আছেন। এরা কলোনাইজারদের মত এ ঘটনাকে নিছক সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বে ফিউডাল প্রতিক্রিয়া হিসেবে চালিয়েছেন এবং ধ্বংসোন্মুখ অভিজাতদের মৃত্যু যন্ত্রণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এদের মতে সিপাহীদের লক্ষ্য নাকি ছিল প্রতিবিপ্লব, তারা ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। এটা পরিষ্কার এ রকম তত্ত্বীয় কুয়াশা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো এই বিপ্লবের বিরাটত্ব ও মাহাত্ম্যকে খাটো করা। এসব দেশী সাহেব সেদিন কলোনির শিক্ষায় এতখানি প্রাণিত হয়েছিলেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইকেও তারা ফিউডাল প্রতিক্রিয়ার উর্ধ্বে চিন্তা করতে পারেননি। কারণ একটাই তাদের মন-মানসও ঐ শিক্ষায় উপনিবেশিত হয়ে পড়েছিল। এইসব উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবী যেটা বুঝতে পারেননি সেটা হলো বিদেশী শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং যে শাসনকে বহু লোক জুলুম মনে করে তার উচ্ছেদ চেয়েছিল- ১৮৫৭’র এই বিপ্লবী লক্ষকে সেদিনের প্রেক্ষাপটে কোনভাবেই ফিউডাল প্রতিক্রিয়া বলা যায় না।
ইংরেজ শাসনের মৌল বৈশিষ্ট্যই ছিল শোষন ও লুণ্ঠন, তবে তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াইকে প্রগতিবিরোধী বলি কোন যুক্তিতে? তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত বড় বিপ্লবী অভ্যুত্থান আর কখনো দেখা যায়নি, যা সাম্রাজ্যবাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির চেষ্টা। এই যুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ, যুদ্ধের প্রতি সাধারণ মানুষের বিপুল সহানুভূতি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এই লক্ষণগুলো কিন্তু পুরোপুরি জাতীয় ভাবাপন্ন। এখানে স্বতঃস্ফূর্ত এক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছে। শুধু সামন্ত রাজা ও নওয়াবরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে এটা ফিউডাল ও প্রতিক্রিয়াশীল সেটা ভাবা অযৌক্তিক, তাহলে তো একই যুক্তিতে দখলদার ইংরেজকে হটিয়ে দেশোদ্ধারের চেষ্টায় যেভাবে জোয়ান অব আর্ক ফরাসী অভিজাত ও জনগণকে একত্রিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাকেও আমরা প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয় ভাবাপন্ন না বলে প্রত্যয়ন করতে পারি। কিন্তু সেই আন্দোলনকে তো কখনো জাতীয় আখ্যা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি।

১৮৫৭’র লড়াই যখন চলছে তখন কার্ল মার্কস এ ঘটনাটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল এ লড়াই মূলত আন্তর্জাতিক উপনিবেশবাদবিরোধী লড়াইয়ের অংশ। ভারতবর্ষে উপনিবেশ লুণ্ঠনই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং ভারতীয় জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল বৃটিশ উপনিবেশকে ধ্বংস করে ভারতীয়দের স্বাধীন-সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা। মার্কসের এই বিশ্লেষণকে সেদিনের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট প্রগতিশীল মনে করা সঙ্গত। কেননা তিনি এই যুদ্ধের স্বরূপ চিনতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, মার্কস সেই সব দেশীয় রাজার নিন্দা করেছেন যারা ইংরেজকে সহযোগিতা করেছিল। তিনি তাদেরকে ইংরেজদের পোষা কুকুর হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তবে মার্কস শেষ পর্যন্ত বৃটিশদের আগ্রাসনকে পুঁজিবাদের আগ্রাসন হিসেবেই দেখেছেন এবং তিনি তার বিশ্ব দৃষ্টিকে তার তত্ত্বের বাইরে নিতে চাননি। ঔপনিবেশিক যুদ্ধগুলোর পিছনে পুঁজিবাদের একটা বড় ভূমিকা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু এটা যে একই সাথে একটা বর্ণবাদী, সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক লড়াইও তা মার্কস গণনার মধ্যে নেননি বা নিলেও তা তার তত্ত্বের আলোয় বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন মাত্র।

সূত্রঃ বদ্বীপ প্রকাশন প্রকাশিত ‘মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭’ গ্রন্থ

দ্বিতীয় পর্বঃ উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই, ১৮৫৭’র লড়াই এবং সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)